কয়েকটি মৃত্যু
জহির রায়হান

কয়েকটি মৃত্যু

জহির রায়হান

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার ২৫ বছর

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম অনুপম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৯৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৩০·০০ টাকা

ISBN 984-404-096-5

KAEKTI MIRTU : A Bengali Novel by Zahir Raihan
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price : Tk. 30.00 US$ 3 only

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- শেষ বিকেলের মেয়ে
- তৃষ্ণা
- হাজার বছর ধরে
- আরেক ফাল্গুন
- আর কত দিন
- বরফ গলা নদী
- একুশে ফেব্রুয়ারী
- উপন্যাস সমগ্র
- গল্প সমগ্র
- প্রবন্ধ সমগ্র (প্রকাশিতব্য)
- চিত্রনাট্য সমগ্র (প্রকাশিতব্য)
- রচনা সমগ্র (প্রকাশিতব্য)

গলিটা অনেকদূর সরলরেখার মতো এসে হঠাৎ যেখানে মোড় নিয়েছে, ঠিক সেখানে আহমদ আলী শেখের বসতবাড়ি।

বাড়িটা এককালে কোনো এক বিত্তবান হিন্দুর সম্পত্তি ছিলো। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের চব্বিশ-পরগণার ভিটেবাড়ি, জমিজমা, পুকুর সবকিছুর বিনিময়ে এ দালানটার মালিকানা পেয়েছেন। মূল্যায়নের দিক থেকে হয়তো এতে তাঁর বেশকিছু লোকসান হয়েছে, তবু অজানা দেশে এসে মাথাগোঁজার একটা ঠাঁই পাওয়া গেলো সে-কথা ভেবে আল্লাহর দরগায় হাজার শোকর জানিয়েছেন আহমদ আলী শেখ।

সেটা ছিলো উনিশশো সাতচল্লিশের কথা।

এটা উনিশশো আটষট্টি।

মাঝখানে একুশটা বছর পেরিয়ে গেছে।

সেদিনের প্রৌঢ় আহমদ আলী শেখ এখন বৃদ্ধ। বয়স তাঁর ষাটের কোঠায়।

বড় ছেলে সাঁইত্রিশে পড়লো।

মেজো'র চৌত্রিশ চলছে।

সেজো আটাশ।

ছোট ছেলের বয়স একুশ হলো।

বড় তিন ছেলের ভালো ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছেন তিনি। বউরা সব পরস্পর মিলেমিশে থাকে। একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে না, বিবাদ করে না। তাই দেখে আর অনুভব করে কর্তা-গিন্নির আনন্দের সীমা থাকে না। মনে মনে তাঁরা আল্লাহকে ডাকেন। আর বলেন—তোমার দয়ার শেষ নেই।

আহমদ আলী শেখের নাতি-নাতনীর সংখ্যাও এখন অনেক। বড়র ঘরে পাঁচজন।

মেজোর দুই ছেলেমেয়ে।

সেজো পরে বিয়ে করলেও তার ঘরে আটমাসের খুকিকে নিয়ে এবার তিনজন হলো।

মাঝে মাঝে ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি-নাতনীদের সবাইকে একঘরে ডেকে এনে বসান আহমদ আলী শেখ।

তারপর, চেয়ে-চেয়ে তাদের দেখেন। একজন চাষি যেমন করে তার ফসলভরা ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকেন তেমনি সবার দিকে তাকিয়ে দেখেনে আহমদ আলী শেখ, আর মনে মনে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। ইয়া আল্লাহ, এদের তুমি ঈমান-আমানের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখো।

এখন রাত।

আহমদ আলী শেখ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রোজকার অভ্যেসমতো খবরের কাগজ পড়েন।

রাজনৈতিক খবরাখবরে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই। দল গড়ছে। দল ভাঙছে। দফার পর দফা সৃষ্টি করছে। আর বক্তৃতা দিচ্ছে। ভিয়েতনামে ত্রিশজন মরলো। রোজ মরছে। তবু শেষ হয় না। আইয়ুব খানের ভাষণ। আর কাশ্মির। কাশ্মির। কাশ্মির পড়তে পড়তে মুখ ব্যথা করে উঠে।

আহমদ আলী শেখ মামলা-মোকদ্দমার খবরগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। আর পড়েন পাটের বাজারে উঠতি–পড়তির খবরাখবরগুলো কিংবা নতুন করে দালান, কোঠা, ব্রিজ, কারখানা তৈরির খবর থাকলে সেগুলো খুঁটিয়ে পড়েন।

পড়েন। কারণ, তাঁর বড় ছেলে উকিল।

সেজো ছেলে পাটের কারবারি।

আর মেজো ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।

আহমদ আলী শেখ খবরের কাগজের পাতা উলটে চলেছেন। অদূরে তাঁর তিন নাতি বসে পরীক্ষার পাঠ মুখস্থ করছে।

তাদের মধ্যে একজনের চোখ ঘুমে ঢুলঢুল। আরেকজন কী যেন লিখছে। অন্যজন চিৎকার করে পড়ছে :

আল্লাহতায়ালা বাবা আদম ও মা হাওয়াকে তৈরি করিলেন এবং ফেরেস্তাদের ডাকিয়া বলিলেন— হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা ইহাকে সেজদা কর। সকল ফেরেস্তা তখন নতজানু হইয়া বাবা আদম ও মা হাওয়াকে সেজদা করিল। করিল না শুধু একজন। তাহার নাম ইবলিশ। আল্লাহতায়ালা বলিলেন—হে ফেরেস্তা-শ্রেষ্ঠ ইবলিশ। আমি তামাম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ইনসানকে পয়দা করিয়াছি। ইহাদের সেজদা কর। ইবলিশ তবু রাজি হইল না।

বাচ্চাটা চিৎকার করে পরীক্ষার পড়া পড়ছে।

গিন্নি, জোহরা খাতুন জায়নামাজে বসে তছবি গুনছেন।

আহমদ আলী শেখের চোখজোড়া তখনো খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ। এমনি সময় ঘরে কড়া–নাড়ার শব্দ হলো।

কাগজ থেকে মুখ তুললেন বুড়োকর্তা। কে ?

যে–ছেলেটা এতক্ষণ পড়ছিলো, সে পড়া থামিয়ে বাইরের ঘরের দিকে তাকালো।

উঠে এসে বৈঠকখানার বাতিটা জ্বাললেন আহমদ আলী শেখ। দরোজা খুললেন।

খুলে সামনে যাকে দেখলেন তাকে এইমুহূর্তে এখানে আশা করেননি তিনি।

একমাত্র মেয়ে আমেনা।

কিরে তুই ? কোনো খবর নেই, কিছু নেই। হঠাৎ।

আমেনা বাবাকে সালাম করতে করতে বললো, কেন ? ও টেলিগ্রাম করেছিলো পাওনি ?

কই নাতো ? বুড়োকর্তা অবাক হলেন। জামাই আসেনি ?

না।

তুই একা এসেছিস ?

না। সঙ্গে মফিজ মামা আর মামীও এসেছেন।

ওরা কোথায় ? কথাটা বলবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন দুজন। মফিজ মামা আর তার স্ত্রী।

বুড়োকর্তা তাদের দেখে চিৎকার করে উঠলেন, আরে তোমরা, এসো, এসো, ভেতরে এসো। ইয়া আল্লা, আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো। আঁ। সেই বারো–তেরো বছর পর দেখা হলো তাই না ?

মফিজ মামা হাসলেন। হ্যাঁ। বারো–তেরো বছর হবে। এই দেখো না, মানুষ চোখের সামনে না-থাকলে মন থেকেও দূর হয়ে যায়। সেই কবে থেকে করাচীতে পড়ে আছি। তোমরা একটু খোঁজ-খবরও নাও না।

কথা বলার ফাঁকে তাদেরকে ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন আহমদ আলী শেখ। আবদুল। আবদুল। উল্লুকটা গেলো কোথায়। শোন্. আমেনার মালপত্রগুলো সব ভেতরে এনে রাখ্। তারপর, তোমার চুলগুলো সব পেকে একেবারে সাদা হয়ে গেছে দেখছি আঁ? পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো? ভালো, ভালো। কইরে, আহসান মকবুল এরা সব গেলো কোথায়। এদিকে আয়, তোদের মফিজ মামা এসেছে। একে চিনতে পারছো? এ হচ্ছে মেজো ছেলে। মানে আহসান। ইঞ্জিনিয়ার। আরে? তোকে অসুস্থ শরীরে এখানে আসতে বললো কে? একে তুমি ঠিক চিনতে পারবে না হে। তখন সে একেবারে বাচ্চা ছিলো। সবার ছোট ছেলে শামছু। পেটের অসুখে ভুগে-ভুগে স্বাস্থ্যখানা কী করেছে দেখো না। যাও যাও তুমি গিয়ে শুয়ে থাকোগে। তারপর তোমার খবর টবর কী বলো।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মফিজ মামা। দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। মনসুর না?

বাড়ির বড় ছেলে মনসুর ওকালতির বইপত্র বগলে বাইরে থেকে ফিরছিলো।

বুড়োকর্তা একগাল হেসে বললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ মনসুর। ও এখন শহরের জাঁদরেল উকিল। চিনতে পারছো না? ইনি তোমার মফিজ মামা। সালাম করো, সালাম করো। জানো, ওর এখন ভীষণ নামডাক। মনসুর-উকিল বললে সারা শহরের লোকে তাকে চেনে। সকালবেলা তো মক্কেলের ভিড়ে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে পড়ে।

হঠাৎ কী মনে হতে বুড়ো চিৎকার করে উঠলেন। আবদুল। আবদুল। ডেকে ডেকে উল্লুকটার কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না।

আবদুল বাড়ির বয়স্ক চাকর। হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে এলো সে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

জি। বউডার অসুখ।

বউডার অসুখ তো তুই ওখানে বসে-বসে করছিস কী। উজবুক কোথাকার। রোজ এক কথা ক'বার করে বলবো। দেখছিস না সাহেব বাইরে থেকে ফিরেছে। বইপত্রগুলো আলমারিতে রাখ। হাতমুখ ধোয়ার পানি দে। আরে হ্যাঁ তুমি বসো। আমি এই ফাঁকে চট করে নামাজটা সেরে নি।

পাশের ঘরে গিন্নি জোহরা খাতুন তখন মফিজ সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছেলের বউদের আলাপ–পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

এ হলো বড় বউ। এ মেজো। আর এ হচ্ছে সেজো। ইনি তোমাদের মামী। করাচীতে ছিলেন তাই এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

মামী চিবুক ধরে বউদের আদর করলেন। আপনাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছে বুবু। দেশের সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলোকে বাছাই করে এনে ঘরের বউ বানিয়েছেন।

তিন বউ লজ্জায় রাঙা হল।

ননদিনী আমেনা সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো।

গর্বিতা শাশুড়ি জোহরা খাতুন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন— সব আল্লাহর মেহেরবানি।

হ্যাঁ, তাই। নইলে এমন সুন্দর আর সৎস্বভাবের তিন-তিনটি বউ ক'জন শাশুড়ির ভাগ্যে জোটে।

জানো ভাবী, পাঁচটা শাশুড়ির মতো আমি বউদের সঙ্গে সারাক্ষণ খিটিমিটি করি না। ওরা যেমন আমাকে মান্যিগণ্যি করে, আমিও তেমনি ওদের আদরে-সোহাগে রাখি। ওই তো পাশের বাড়ির টোগর মা, কী মাটি দিয়ে আল্লাহ তাকে পয়দা করেছিলে, বুঝলে ভাবী, বাচ্চা বউটাকে দু-বেলা পেট ভরে খেতেও দেয় না। আর সারাদিন যখনই যাও দেখবে বউটাকে চাকরানির মতো খাটাচ্ছে। ছি ছি ছি এমন স্বভাব যেন আমার শত্রুরও না হয়। তবে হ্যাঁ; বউদের আমি যে একেবারে শাসন করি না তা নয়। শাসন করি। মেয়েদের জোরে-জোরে কথা বলা উনি মোটেই পছন্দ করেন না। উনি বলেন, মেয়েরা এমনভাবে কথা বলবে বাড়িতে কাকপক্ষী আছে কি নাই বোঝা যাবে না। রাস্তার লোকে বাড়ির বড়ঝিদের গলার আওয়াজ শুনবে কেন ? ওরা প্রথম প্রথম, অবশ্য সবসময় না, মাঝে মধ্যে, একটু হৈ-চৈ করতো। আমি নিষেধ করে দেওয়ার পর থেকে কেউ এসে বলুক দেখি আমার কোন্ বউয়ের গলার আওয়াজ কেমন ?

তিন বউ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো। জোহরা খাতুন বললেন—একি, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আমেনার ঘরটা ঝেড়েমুছে ঠিক করে দাও। আমার আলমারিতে ধোয়া চাদর আছে। একটা বের করে দিও। আর শোন্, মশারীর কি হবে। এক কাজ করো, আমার মশারিটাই নাহয় ওকে টাঙিয়ে দাও। আমাকে মশায় খায় না। তিনজন একদিকে চললে কেন ? একজন রান্নাঘরে যাও। আবদুলের বউটার অসুখ। কাজকর্ম সব পড়ে আছে। একটু পরে আবার বাচ্চা-কাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়বে। ওদের সময়মতো খাইয়ে দিও। এসো ভাবী, তুমি তো আর এ-বাড়িতে কোনোদিন আসোনি, চলো সবার ঘরদোর দেখবে।

একে-একে মামীকে সবার ঘরে নিয়ে গেলেন জোহরা খাতুন।

সব ঘর দেখালেন।

আসবাবপত্র।

চেয়ার টেবিল।

বাক্স দেরাজ।

এগুলো সব ছেলেরা নিজেদের রোজগার থেকে কিনেছে। উনি তো বেশ ক'বছর হলো পেনশন নিয়েছেন। তারপর থেকে ঘর-সংসারের যাবতীয় খরচ ছেলেরাই চালাচ্ছে। আল্লাহ্ এদের রুজি-রোজগারে আরো বরকত দিক। কথা হলো ভাবী, ছেলেপিলেদের বাপ-মা এত কষ্ট করে মানুষ করে কেন। বুড়ো বয়সে একটু আরামে থাকবে সেজন্যে তো, আল্লায় দিলে সে আরাম আমরা পেয়েছি।

জোহরা খাতুনের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

মেয়ে আমেনাকে কোলের কাছে টেনে এনে বসালেন তিনি। আর গায়ে-মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে শুধালেন—জামাই কেমন আছে ?

ভালো।

তোমাকে একা পাঠালো। সঙ্গে এলো না কেন ?

কেমন করে আসবে। ছুটি পেলে তো ? বড় সাহেব ছুটি দিতে চায় না। ও না থাকলে অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় কিনা তাই। সেই কবে থেকে আসার জন্যে ছটফট

করছি। একা আসবো, সাহস হয় না। শেষে মফিজ মামারা আসছেন শুনে বললাম, আমি ওদের সঙ্গে চলে যাই, তুমি ছুটি পেলে পরে এসো।

জামাই কী বললো ?

বলবে আবার কী। চলে আসবো শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেলো। জানো মা, ও না আমাকে ছেড়ে একমুহূর্তও কোথাও থাকতে পারে না। কথাটা বলতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হলো আমেনা। ছি ছি একথা বললো সে। এটা ঠিক হয়নি।

বুড়ো গিন্নি নিজেও মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা বললেন, হ্যাঁরে, তুই কাপড়-চোপড় ছাড়বিনে। যাগে, হাতমুখ ধুয়ে নে। এতদূর থেকে এসেছিস। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করগে যা। একগ্লাস দুধ এনে দেবো, খাবি ?

না মা। দুধ খেলে আমার এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে। মায়ের সামনে থেকে সরে গেলো আমেনা।

ও চলে গেলে মামীর দিকে তাকিয়ে জোহরা খাতুন মৃদু হাসলেন। বললেন—এখনো একেবারে বাচ্চা রয়ে গেছে। কার সামনে যে কী কথা বলতে হয় কিছু জানে না। ওটা ওই ছোটবেলা থেকে এ-রকম।

পানের বাটাটা এবার সামনে টেনে নিলেন তিনি। তারপর আবার সংসারের নানা আলাপের মাঝখানে হারিয়ে গেলেন।

আমেনার দিকে চেয়ে তিনবউ মুখ টিপে হাসলো। বড়বউ বললো— কিরে ক'মাস ?

ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিলো আমেনা। জানি না।

তিনবউ ওকে তিনদিক থেকে ছেঁকে ধরলো।

বল না। বল্ নারে।

ইস বিয়ে হতে না হতেই ?

আমি কিন্তু ঠিক বলে দিতে পারবো।

কচু। আমেনা মুখ ভেংচালো।

বড়বউ বললো—জামাই তোকে খুব আদর করে তাই না ?

মেজোবউ বললো—বিয়ের সময় তো খুব হাত-পা ছুড়ে কাঁদছিলি। এখন কেমন লাগছে অ্যাঁ।

ছোটবউ বললো—এই মিনা শোন্। বলে আমেনার মুখটা কাছে টেনে এসে চাপা-স্বরে কানে কানে বললো— শফি ভাই বিয়ে করেছে।

কবে ? আমেনা চমকে উঠলো যেন।

এই তো গত মাসে।

কোথায় ?

কোথায় ঠিক জানি না, শুনেছি বাড়ির কাছে টাঙ্গাইলে। বউটা নাকি ভীষণ সুন্দর দেখতে।

ও ! আমেনা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

জোহরা খাতুন এসে তিন বউকে ডাক দিলেন। কই তোমরা এসো, বাচ্চাদের খাওয়ার পাট চুকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। তারপর বুড়োরা খাবে !

আমেনা ছোট বউকে তার কাছে রেখে দিলো। তোমরা যাও মা। ছোটভাবী আমার কাছে এখন থাকুক। একটু গল্প করবে।

মা আর দুই বউ চলে যেতে আমেনা বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো— পুরুষ মানুষগুলো ভীষণ স্বার্থপর, তাই না ভাবী?

ছোটবউ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। বললো—বিয়ের পর এইতো সেদিন আমাদের এখানে এসেছিলো শফি ভাই। আমিও ছাড়িনি। বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি।

কী শুনিয়েছো? উঠে আবার বসলো আমেনা। কী শুনিয়েছো বলো না ভাবী?

বললাম— আপনি একটা এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ। খুব তো লম্বা লম্বা কথা বলতেন, মিনাকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমি এ পৃথিবীতে আর কাউকে চিন্তা করতে পারি না। ওকে না-পেলে সারাজীবন আমি আর বিয়ে করবো না। এখন? এখন কী হলো?

শুনে কী বললো? আমেনার গলার স্বরে ঈষৎ উত্তেজনা।

ছোটবউ জবাব দিলো— কী আর বলবে। বলার মুখ আছে? মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছু বললো না?

না।

আমেনা নীরবে কিছুক্ষণ ছোটবউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আসলে আমি একটা বোকা মেয়ে ভাবী। কেমন করে ওর ফাঁদে পা দিয়েছিলাম ভেবে দেখো তো। সম্পর্কে মামাতো ভাই। তাই বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়া আর মেলামেশায় কোনো বাধা ছিলো না। তুমি তো সব জানো ভাবী।

প্রথম প্রথম সে কী কথা বলতো?

কেমন করে তাকিয়ে থাকতো।

আর আমি দুর্বল হয়ে গেলাম।

প্রেমে পড়লাম।

তোমার কাছে তো কিছুই লুকোইনি আমি ভাবী। আর হ্যাঁ ভাবী, চিঠিগুলো কোথায় রেখেছো?

আছে।

কাউকে দেখাওনি তো?

না।

আল্লার কসম?

আল্লার কসম।

কোথায় রেখেছো। নিয়ে এসো তো।

না এখন পারবো না। সেই ট্রাঙ্কের মধ্যে একগাদা কাপড়-চোপড়ের নিচে। কাল দুপুরে বের করে দেবো। কিন্তু ওগুলো দিয়ে এখন কী করবি তুই?

পুড়িয়ে ফেলবো। মনে হলো এক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়বে আমেনা। সত্যি, আমি একটা বোকা মেয়ে ভাবী। বাবা যখন বিয়ে ঠিক করে ফেললো—তোমরা তো দেখেছো, কত কেঁদেছিলাম আমি। তোমরা আমায় বুঝিয়েছিলে। কেঁদে কি হবে। কাঁদিসনে।

বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে কথা কী জানো ভাবী, লোকটার চরিত্র বলে কিছু নেই। একটা আস্ত ছোটলোক। সহসা চুপ করে গেলো আমেনা।

স্বামীর কথা মনে পড়লো।

কেন যেন তাকে এখন আরো বেশি করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে আমেনার। মনে মনে ভাবলো, খেয়েদেয়ে এসে ওর কাছে একটা চিঠি লিখতে হবে।

নামাজ পড়া শেষ করে বুড়োকর্তা আহমদ আলী শেখ আবার পরিচয়–পর্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওকে যখন তুমি দেখেছো তখন সে হাফপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু আমার সেই সেজো ছেলেটাকে বুঝলে মফিজ, বড় ইচ্ছে ছিলো সি.এস.পি. বানাবো। উল্লু কোথাকার আবার দাঁত বের করে হাসে দেখ না। তিনি এখন ব্যবসা করছেন। পাটের ব্যবসা। অবশ্য ব্যবসায় রুজি-রোজগার ভালোই হচ্ছে।

সহসা বুড়োকর্তার চোখ পড়লো বাচ্চাছেলেটার দিকে। ঐ দ্যাখো। লেখাপড়া ফেলে তিনি এদিকে হা করে তাকিয়ে আছেন। কাল না তোর পরীক্ষা। ভালোমতো পড়াশোনা করো। পড়ে পড়ে পুরো বইটাকে মুখস্থ করে ফেলো। রেজাল্টটা যদি ভালো হয় তাহলে কালাচাঁদ থেকে একসের মিষ্টি কিনে খাওয়াবো তোমায়। পড়ো, পড়ো।

ঠিক এমনি সময় দরজা দিয়ে চোরের মতো ভেতরে এলো দুটি চৌদ্দ–পনেরো বছরের ছেলেমেয়ে।

আহমদ আলী শেখ তাদের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। এই যে, কোত্থেকে এলে তোমরা অ্যাঁ ? কোথায় গিয়েছিলে ?

বাইরে।

বাইরে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কোথায় ?

ছোট খালার বাসায়।

এতক্ষণ সেখানে কী করছিলে ? তোমাদের না সন্ধের পর বাইরে কোথাও থাকতে নিষেধ করেছিলাম। একটু সুযোগ পেলেই দুজনে ফাঁকি দিয়ে এদিক–সেদিক ঘুরঘুর করো। দাঁড়াও, এবার তোমাদের দুজনকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবো আমি। সহসা মফিজ মামার দিকে তাকালেন আহমদ আলী শেখ। মৃদু হেসে বললেন—আমার বড় নাতি। মনসুরের ছেলে রসুল। আর ওর নাম রেখেছি পেঁচি— মেজোর বড় মেয়ে। দুটিতে বড় ভাব। দাঁড়াও, তোমাদের রোজ-রোজ বাইরে যাওয়ার মজা দেখাচ্ছি আমি।

রসুল আর পেঁচি মাথা নত করে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে ধীরেধীরে ভেতরে চলে গেলো। বাচ্চাছেলেটা এতক্ষণ চেয়ে-চেয়ে ওদের দেখছিলো। আড়চোখে একবার বুড়োকর্তাকে দেখে নিয়ে আবার বইয়ের প্রতি মনোযোগ দিলো :

আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। কিন্তু ইবলিশ তবু রাজি হইলো না। ইবলিশ বলিলো—হে রাব্বুল আলামীন। ইহারা মাটির তৈরি। আর আমাদের আপনি আগুন দ্বারা তৈরি করিয়াছেন। আমরা আগুনে তৈরি হইয়া কেন মাটির ঢেলাকে সেজদা করিবো।

জোহরা খাতুনের গলার স্বরে বুড়োকর্তার চমক ভাঙলো। কি, মেহমানকে নিয়ে সারারাত গল্প করবে নাকি ! খাবে না ? সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বুড়োকর্তা সহসা চিৎকার করে উঠলেন। আবদুল, আবদুল, উজবুক কোথাকার। বাইরে হাতমুখ ধোয়ার পানি দিয়েছিস ? জলদি করে দে। এসো মফিজ, হাতমুখ ধুয়ে নাও।

গিন্নি চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে থামালেন আহমদ আলী শেখ। শোনো, মনসুর আহসান ওদের সবাইকে ডাকো। আমেনা কোথায়। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। ওকে তোলো। আজ আমরা সবাই একসঙ্গে খাবো। ও-ঘরে জায়গা না হলে, এক কাজ করো, ফরাশ বিছিয়ে দিতে বলো।

বড়বউ মেজো বউয়ের কানে কানে প্রশ্ন করলো। মামা মামী কি আজ রাতে এখানে থাকবেন নাকি ?

মেজোবউ বললো— না, আমেনা বলছিলো ওরা রাতের ট্রেনেই চাটগাঁ চলে যাবে।

যাক বাবা বাঁচোয়া। বড় বউ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, ওদের জায়গা দেবো কোথায়।

ছোটবউ ছুটতে ছুটতে এলো। বড়বু দস্তরখানাটা কোথায়, দেখেছো ?

কেন ?

ওটা পাচ্ছি না। বাইরের ঘরে ফরাশ বিছিয়ে দিতে বললেন মা। সবাই একসঙ্গে ওখানে খাবে।

ও ! মুখ টিপে হাসলো মেজো বউ। বুড়োর আজ আবার ক্ষেতের ফসল দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

ঘরের মধ্যে বুড়োকর্তা আহমদ আলী শেখ তাঁর বিছানায় ঘুমোচ্ছেন। মাঝে মাঝে মৃদু নাক ডাকছে তাঁর।

বাচ্চাছেলেটার চোখেও ঘুম। তবু বসে বসে সে তার পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে তখনো ঃ

আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। ইবলিশ বলিলো, হে সর্বশক্তিমান, আপনি যে মানুষ পয়দা করিয়াছেন ইহারা সমস্ত দুনিয়াকে জাহান্নামে পরিণত করিবে। ইহারা পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিবে। কলহ করিবে। মারামারি করিবে।

বুড়োকর্তা তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

সহসা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি।

দেখলেন, সর্বাঙ্গ সাদা ধবধবে কাপড়-ঢাকা চারটে মূর্তি তাঁর ঘরের চারপাশে এসে দাঁড়ালো।

ধীরে ধীরে মূর্তিগুলো সামনে এগিয়ে এলো।

মনে হলো কারো উদ্দেশ্য যেন সেজদা করলো ওরা। তারপর একসঙ্গে অনেকটা একতালে বুড়োকর্তার বিছানার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। আহমদ আলী শেখ অবাক হয়ে দেখলেন ওদের। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শিহরন অনুভব করলেন বুড়োকর্তা। বুকটা দুরুদুরু কাঁপছে।

হাত-পাগুলো শিরশির করছে।

চারটে মূর্তি মুহূর্তে অসংখ্য মূর্তির রূপ নিলো।

বুড়োকর্তা দেখলেন তাঁর মৃত বাবাকে।

মৃত চাচাকে।

মৃত ভাইকে।

আরো অসংখ্য মৃত আত্মীয়স্বজনকে।

দেখলেন, সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা বলছে।

আহা আমাদের ছেলে এবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

আমাদের কোলের মানিককে এবার আমরা আমাদের কাছে নিয়ে যাবো। জাদু আমার জলদি করে চলে এসো।

খোকন আমার। মানিক আমার। জলদি করে চলে এসো। বুড়োকর্তা শিশু আহমদ আলীকে তার দাদুর কোলে প্রত্যক্ষ করলেন।

বুড়ো তাকে আদর করছে আর বলছে— মানিক আমার। মানিক আমার। যুবক আহমদ আলী শেখকে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বুড়োকর্তা। দেখলেন, সেই মেয়েটিকে, যার সঙ্গে একবার বিয়ের কথা হয়েছিল ওঁর। পরে দেনা-পাওনা নিয়ে দাদুর সঙ্গে গোলমাল লেগে যাওয়ায় বিয়েটা ভেঙে যায়।

মেয়েটি হাসলো। আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। চলে এসো।

চলে এসো। চলে এসো। অসংখ্য মূর্তি হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাঁকে। বুড়ো কর্তার ঘুম ভেঙে গেলো।

চোখ বড় বড় করে চারপাশে তাকালেন আহমদ আলী শেখ। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখলেন ঘরে কেউ নেই। শুধু সেই বাচ্চাছেলেটা পড়ার টেবিলে বসে ঘুমে ঢুলছে।

সারাশরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে বুড়োকর্তার। সহসা প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। হায় হায় হায়, একি দেখলাম। একি স্বপ্ন দেখলাম আমি। আল্লারে একি স্বপ্ন দেখলাম। ইয়া খোদা এ কী স্বপ্ন তুমি দেখালে আমাকে। ও মনসুর। মকবুল। আহসান। হায় হায় একি স্বপ্ন দেখলাম।

বুড়োকর্তার চিৎকারে বাচ্চাছেলেটা ফিরে তাকালো ওঁর দিকে। বাড়ির অন্য সবাই আলুথালু বেশে ছুটে এলো সেখানে।

কী হয়েছে।

কী হয়েছে।

অ্যাঁ। কি হলো। চিৎকার করছো কেন? কী হয়েছে?

ওদের সকলকে কাছে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন আহমদ আলী শেখ। কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীর তখনো থরথর করে কাঁপছে।

কাঁপা গলায় বিড়বিড় করে বললেন— হায় হায় একি স্বপ্ন দেখলাম। আল্লায় কি দেখালো আমাকে।

বড় ছেলে বললো— কী হয়েছে আব্বা। কী স্বপ্ন দেখেছেন।

খুব খারাপ স্বপ্ন।

মেজোছেলে ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করলো। স্বপ্ন দেখে অত চিৎকারের কী হয়েছে।

সেজোছেলে বললো—স্বপ্ন তো সবাই দেখে।

ছোটছেলে বললো—আমি অসুস্থ মানুষ। চিৎকার শুনে বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। ভাবলাম কেউ বুঝি মারাই গেলো। উহ্।

মরেনি, মরেনি। মরবে। বুড়োকর্তা তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মনসুরের মা তোমার মনে আছে আমার আব্বা একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই–যে চারটে সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্তি এসে খাটের চারপাশে দাঁড়ালো। মনে নেই ? সেই স্বপ্ন দেখার পরদিন তো আব্বা আর মেজো ভাই হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। জোহরা খাতুন শিউরে উঠলেন। ইয়া আল্লাহ্, এ স্বপ্ন কেন দেখালেন।

বুড়োকর্তা বললেন—বাইশ বছর আগের কথা। মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন। আব্বা স্বপ্ন দেখে বললেন, খুব খারাপ স্বপ্ন। নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটবে। দ্যাখো, তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। আল্লার কী মেহেরবানি। কিন্তু আজ হঠাৎ আমি সেই স্বপ্ন আবার দেখলাম কেন ?

বড়ছেলে সান্ত্বনা দিলো। ও কিছু না আব্বা। আপনি শুয়ে পড়ুন।

না না তোমরা বুঝতে পারছো না। বুড়োকর্তা বললেন। নিশ্চয়ই কোনো একটা অঘটন ঘটবে! নইলে এতদিন পরে সে স্বপ্ন আবার দেখলাম কেন আমি। নিশ্চয়ই কেউ মারা যাবে।

খালি মরার কথা আর মরার কথা। ছোটছেলে কাঁদো–কাঁদো কণ্ঠে বললো। আমি অসুস্থ মানুষ। আমার সামনে খালি মরার কথা।

সেজোছেলে বললো— তুই এখানে এসেছিস কেন ? গিয়ে ঘুমোগে।

ঘুম আর হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় এত মরার কথা শুনলে কারো ঘুম হয় ?

হাতের কাছে রাখা গামছাটা তুলে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছলেন আহমদ আলী শেখ।

ঘরের কোণে রাখা পাখাটা এনে শ্বশুরকে বাতাস করতে লাগলো মেজোবউ।

বুড়োকর্তা সবার মুখের দিকে একবার করে তাকালেন।

ছেলেদের দেখলেন।

বউদের দেখলেন।

আমেনাকে দেখলেন।

রসুল আর পেঁচিকে দেখলেন।

নিজের গিন্নির দিকে তাকালেন।

ভরা ফসলের ক্ষেতে পোকা-পড়ার পর অসহায় আতঙ্ক নিয়ে একজন চাষি যেমন করে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমন করে।

আশ্চর্য। মানুষ যে চিরকাল বেঁচে থাকে না। একদিন তাকে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যেতে হয় এতবড় সত্যটাকে আমি কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম।

নিজের বিছানার এককোণে চুপচাপ বসে বসে তাই ভাবছিলো মনসুর আলী শেখ।

দিনরাত আমি শুধু ওকালতির দলিল–দস্তাবেজ আর বইপত্র নিয়ে মশগুল ছিলাম।

কোর্টে গেছি।

কোর্ট থেকে ফিরে এসেছি।

মক্কেলদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মামলার নথিপত্র ঠিক করেছি।

হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তিতর্কের মায়াজাল রচনা করে অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ। সেজন্যে টাকাপয়সা ওরা দিয়েছে আমায়। রোজগার আমি প্রচুর

করেছি। কিন্তু সব কিছুই তো ইহকালের জন্যে। পরকালের জন্যে কী করেছি আমি ? আজ যদি আমি মারা যাই, হ্যাঁ আমি জানি সবাই আমার জন্যে কাঁদবে।

তারপর।

তারপর আমাকে কবর দিয়ে আসবে ওরা।

একা।

আমি তখন একা !

সেই অন্ধকার কবরে তখন মনকীর-নকীর দুই ফেরেস্তা আসবে। ওরা আমাকে জাগাবে।

প্রশ্ন করবে।

আমি কে।

আমার পিতার নাম কী।

পরকালের জন্য কী কী করেছি আমি ?

তখন !

তখন কী জবাব দেবো আমি।

আমার চোখের সামনে যখন ওরা আমার সারাজীবনের নেকি-বদির খাতাটা খুলে ধরবে আর বলবে— জীবনভর তুমি শুধু মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো।

নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্যে অহরহ মিথ্যে কথা বলেছো। মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে।

তখন।

তখন কী কৈফিয়ত দেবো আমি ওদের কাছে ?

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন মনসুর আলী শেখ।

বড়বউ পানের বাটা সামনে নিয়ে সুপুরি কাটছিলো। সহসা প্রশ্ন করলো—আব্বা যে বললেন ঐটা কি সত্যি ?

কী ? অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর দিকে তাকালো মনসুর আলী।

ওই স্বপ্নের কথা। বড়বউ বললো। মানে ওই স্বপ্ন দেখার পর কি সত্যিসত্যি তোমার দাদা আর চাচা মারা গিয়েছিলো ?

হ্যাঁ। নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মনসুর আলী। সহসা ডাকলো। এই শোনো।

কী ?

আব্বার জায়নামাজটা কোথায় ? নিয়ে এসো তো।

জায়নামাজ দিয়ে কী করবে ? বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো বড়বউ।

মনসুর আলী সংক্ষেপে জবাব দিলো— নামাজ পড়বো।

সেকি ! আজ হঠাৎ নামাজ পড়তে চাইছো ?

না, মানে, কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো মনসুর আলী। তারপর স্ত্রীর উপরে রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে। তোমার ওই মুখে-মুখে তর্ক করার অভ্যেসটা এখনো গেলো না। যা বলছি তাই করো। জায়নামাজটা কোথায় আছে খুঁজে নিয়ে এসো।

স্বামীর কাছ থেকে হঠাৎ এ-ধরনের ব্যবহার আশা করেনি বড়বউ। সেই দুঃখেই হয়তো মুখ দিয়ে একটা কটু কথা বেরিয়ে গেলো ওর। হুঁ, একরাত নামাজ পড়লেই কি আর সারা বছরের পাপ ধুয়ে যাবে ?

কী ? চমকে ফিরে তাকালো মনসুর আলী।

হ্যাঁ। পাপ আমি করেছি বই কী। কিন্তু কাদের জন্য করেছি।

তোমার জন্যে।

তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে।

যে-গয়নাগুলো পরে সবার সামনে সগর্বে ঘুরে বেড়াও সেগুলো কোত্থেকে এসেছে।

যে ভাত আর মুরগির ঠ্যাং চিবিয়ে খাও সেগুলো কোত্থেকে এসেছে ?

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে আর একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সাহস পেলো না বড়বউ। নীরবে জায়নামাজের খোঁজে বেরিয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ ধরে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মেজোছেলে আহসান। কিন্তু কিছুতেই বইয়ে মন বসছে না তার। অথচ ঘুমও আসছে না। মেজোবউ কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করে বললো— হ্যাঁগো। তুমি একটা ইন্সিওরেন্স করেছিলে না ?

হ্যাঁ, করেছিলাম তো। কিন্তু কেন বলো তো ?

না এমনি। হঠাৎ মনে পড়লো তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বইটা বন্ধ করে স্ত্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আহসান।

ধীরেধীরে একটা মৃদু হাসি জেগে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

মেজোবউ অপ্রস্তুত হয়ে বললো— কী ব্যাপার, এমন করে মুখে দিকে চেয়ে আছো কেন ?

তোমাকে দেখছি। আর ভাবছি।

কী ভাবছো ?

ভাবছি আমি মরে গেলে তুমি অনেকগুলো টাকা পাবে। ইন্সিওরেন্সের টাকা।

অকস্মাৎ সারামুখে যেন কেউ কালি লেপে দিলো। বিমর্ষ গলায় মেজোবউ বললো— ছি। আমাকে এত ছোট ভাবলে তুমি। চাই না তোমার টাকা, আমি চাইনা ! বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো। দু-চোখে অশ্রু ঝরলো তার।

মৃদু শব্দে হাসলো আহসান। তোমরা মেয়েজাতটা বড় অদ্ভুত। মুহূর্তে হাসতে পারো। মুহূর্তে কাঁদতে পারো। কী যে পারো কী যে পারো না, ভেবে পাই না।

হয়তো কান্নাটাকে রোধ করার জন্যে কিংবা স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে ছুটে পাশের বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো মেজোবউ।

শব্দ করে দরজাটাকে বন্ধ করে দিলো।

বাড়ির সেজোছেলে মকবুল একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টানছে আর হিসেবের খাতা দেখছে। ছোটবউ তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়ালো।

মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো— কই উত্তর দিলে না।

কিসের উত্তর।

আমি মারা গেলে তুমি আরেকটা বিয়ে করবে, তাই না ?

কী সব বাজে কথা বলছো। মকবুলের কণ্ঠে বিরক্তি।

ছোটবউ-এর গলায় অভিমান। আহা বলো না, আমি মরে গেলে আরেকটা বিয়ে করবে কি না।

না করবো না। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ইস করবো না বললেই হলো। স্বামীর পাশ থেকে বিছানার কাছে সরে গেলো ছোটবউ। নিশ্চয়ই করবে। তোমাকে আমি চিনি না ভেবেছো। আজ আমি মরে যাই, কালকেই আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলবে তুমি।

দ্যাখো, এত ভালো করেই যখন আমাকে চেনো তুমি, তখন মিছেমিছি কেন কথা বাড়িয়ে বারবার আমার হিসেবটা গুলিয়ে দিচ্ছো ? রেগে গেলো মকবুল।

ভ্রুজোড়া ঝাঁকিয়ে ছোটবউ উত্তর দিলো, খাঁটি কথা বললেই পুরুষমানুষগুলো অমন খেপে যায়। সহসা একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। বিছানার চাদরটাকে একটানে গুটিয়ে নিয়ে একপাশে ছুড়ে দিলো। বালিশটাকে ফেলে দিলো মেঝের ওপর। দূর। কার জন্যে গোছাবো এসব। আজ চোখ বুজলেই কাল আরেকটাকে এনে এ বিছানাতে শোয়াবে। দূর। দূর।

হিসেবের খাতা ছেড়ে উঠে এলো মকবুল। বাহুতে হাত রেখে কাছে টেনে আনলো তাকে। কী করছো। শোনো এদিকে এসো। তোমার বয়স কত বলো তো।

কেন বয়স জানতে চাইছো কেন ?

প্রয়োজন আছে। বলো।

বারে, তুমি জানো না বুঝি।

তবু বলো না। স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলো মকবুল।

মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটবউ আস্তে করে উত্তর দিলো— পঁচিশ বছর।

শোনো। পঁচিশ বছরের মেয়েটি শোনো। অদ্ভুত গলায় কাটা কাটা স্বরে বললো মকবুল। আজ আমি যদি মারা যাই তুমি তোমার বাকি বছরগুলো কি বিয়েশাদি না করে বিধবার মতো কাটিয়ে দেবে ?

দেবো। নিশ্চয়ই দেবো। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলো ছোটবউ। আমাকে কি তোমার মত হ্যাংলো পেয়েছো যে আরেকটা বিয়ে করবো ?

তোমার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে আমার। মকবুল ধীরেধীরে বললো। কিন্তু বউ সোনা, তুমি পারবে না। এক বছর। দুবছর। দশবছর পরে হলেও তুমি আরেকটা বিয়ে করবে।

ছোটবউ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো। মকবুল বাধা দিয়ে বললো— সোনা, এতে অন্যায়ের কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। আর আমার কথা জানতে চাও ? আমি একটু আগে তোমার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি সেটা সম্পূর্ণ বানানো। মিথ্যা। তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই বলেছি। বলেছি, কারণ সংসারে বেঁচে থাকতে হলে এই ছোটখাটো মিথ্যে কথাগুলো বলতে হয়। যাকে বলি সেও জানে ওটা মিথ্যে। তবু মিথ্যে সান্ত্বনা পায়। বুঝলে ?

স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসলো মকবুল। অবাকদৃষ্টিতে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছোটবউ। এমন নিষ্ঠুর স্বামী কেউ কোনোদিন দেখেছে পৃথিবীতে ! সে ভাবলো মনে মনে। আর ভাবতে গিয়ে অকারণে ঠোঁটজোড়া বার কয়েক কেঁপে উঠলো তার।

মনসুরের বড়ছেলে রসুল আর মেজোর বড়মেয়ে পেঁচি। খোলা ছাদের এককোণে দুজনে চুপচাপ বসে। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন লুকিয়ে ছাদে চলে আসে ওরা। বসে বসে গল্প করে।

আজ পেঁচি বললো, আমার ভীষণ ভয় করছেরে।

কেন ?

রসুল শব্দ করে হেসে উঠলো। বললো, দূর। দূর। ওসব স্বপ্নের কোনো মানে আছে কি ? বুড়ো কী দেখতে কী দেখেছে। ওসব স্বপ্নেটপ্নে বিশ্বাস করিসনে রে পেঁচি।

পেঁচি ওর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো— কিরে খুব যে গলা ছেড়ে হাসছিস।

কেন কী হয়েছে ?

কেউ টের পেলে তখন বুঝবি মজা। আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো পেঁচি। হঠাৎ কী মনে হতে থেমে গেলো। তারপর মৃদু হেসে বললো— এই, তোর জন্যে আজ একটা জিনিস এনেছিরে।

কী ?

বুকের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে এনে পেঁচি জবাব দিলো— সিগারেট।

দেখি দেখিতো। ওর হাত থেকে প্যাকেটটা লুফে নিলো রসুল। কোথায় পেয়েছিসরে ?

চারপাশে একনজর তাকিয়ে নিয়ে পেঁচি আস্তে করে জবাব দিলো— বাবার পকেট মেরেছি।

বাহ। তুই আজকাল ভীষণ কাজের মেয়ে হয়ে গেছিসরে পেঁচি। দাঁড়া, একটা এক্ষুণি ধরিয়ে খাই। মরার আগে অন্তত একটা দামি সিগারেট খেয়ে মরি।

সহসা পেঁচি বাচ্চামেয়ের মতো হাত-পা ছুড়তে শুরু করলো। এই ভালো হবে না বলছি।

কেন ? কী হয়েছে ?

তুই আবার মরার কথা বলছিস কেন। আমার ভয় লাগে না বুঝি ?

আরে দূর। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়লো রসুল। মরার কথা বললেই কি মানুষ মরে নাকিরে। তোকে বললাম না ওসব স্বপ্নটপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাসনে পেঁচি। সব বাজে, একেবারে ভুয়ো।

ওর কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্তবোধ করলো পেঁচি। পরক্ষণে আবার প্রশ্ন করলো— আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়রে।

যাবে আবার কোথায়। মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পা-জোড়া দোলাতে দোলাতে জবাব দিলো রসুল।

পেঁচি ওর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো— দূর, তুই কিচ্ছু জানিস না। মানুষ মরে গেলে হয় বেহেস্তে যায়, নইলে দোজখে যায়।

সিগারেট খেতে-খেতে একবার ওর দিকে তাকালো রসুল। কিছু বললো না।

আমেনা তার স্বামীর কাছে চিঠি লিখছিলো তখন। আমি নিরাপদে এসে পৌছেছি। পথে কোনো কষ্ট হয়নি। মামা-মামী আমাকে বাসায় পৌছে দিয়ে রাতের ট্রেনে চাটগাঁয়ে চলে গেছেন। এখানে ভাবীরা আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছিলো। ভীষণ লজ্জা লাগছিলো আমার। জানো, ওরা কেউ ভাবতেই পারেনি।

এখানে এসে চিঠি লেখা বন্ধ করলো আমেনা। কী লিখেছে একবার পড়লো।

না। কিচ্ছু হয়নি। আবার লিখতে হবে।

নতুন কাগজ নিয়ে আবার বসলো আমেনা।

জানো, আজ রাতে আব্বা একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছেন। ওটা নাকি আমার দাদুও দেখেছিলেন। দেখার দুদিন পরে তিনি আর আমার মেজোচাচা মারা যান।

আব্বা বলছিলেন নিশ্চয়ই এবারও একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানো, আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি কাছে নেই।

সত্যি মুরব্বিরা বলেন, স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত। তাদের কোনো কথা অমান্য করলে গুনাহ্ হয়।

আজ মনে হচ্ছে ওরা ঠিকই বলেন।

তুমি এখানে আসতে নিষেধ করেছিলে। তোমার বাধা না-মেনে আমি চলে এসেছি। দ্যাখোতো, এসে কী বিপদে পড়েছি।

ওগো তুমি আর দেরি করো না। জলদি করে চলে এসো। যদি ছুটি না পাও তাহলে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করো। আমি আর কোনোদিন তোমার কথা অমান্য করবো না।

ওগো। আমার ভীষণ ভয় করছে।

লিখতে গিয়ে আবার থামলো আমেনা।

পুরোটা পড়লো।

তারপর আবার লিখতে শুরু করলো সে।

ছোট ছেলে শামসু বেশ কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছে। পেটের অসুখ। তেমনি সাংঘাতিক কিছু না হলেও দিনে দিনে শরীরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ওর।

শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে দেহটা।

অনেক কসরতের পর সবেমাত্র ঘুম এসেছে তার।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে।

বাবা যে-মূর্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলেন তেমনি চারটি মূর্তি।

মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে ও'র চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো। আহা, আমাদের ছেলে এবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। খোকন আমাদের। মানিক আমাদের।

আতঙ্কে সমস্ত দেহ হিম হয়ে গেলো শামসুর।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো। মূর্তিগুলো একটা লম্বা ফিতে দিয়ে ওর দেহের মাপ নিচ্ছে।

হ্যাঁ। কবরটা কত বড় হবে দেখে নাও।

দেখো, কবরের মাপ যেন আবার ভুল না হয়।

তীব্র একটা আর্তনাদের সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেলো ওর। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলো শামসু। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো অন্ধকার, ঘর খালি। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সে।

ও বাবাগো। আব্বা। আম্মারে। আমি তো মরে গেলাম। আব্বাগো আমি তো মরে গেলাম। ও আব্বা।

চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এলো সে ঘরে।

কী হয়েছে।

কী হলো।

কাঁদছিস কেন ?

কী হয়েছে অ্যাঁ।

বাচ্চাছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শামসু জবাব দিলো—আমি মরে যাবো। মরে যাবো। এইমাত্র ওরা এসে আমার কবরের মাপ নিয়ে গেছে। আম্মা, আম্মাগো। বলে মাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

কান্নার মাঝখানে শামসু বললো, সেই সাদা সাদা মূর্তিগুলো আব্বা যাদের কথা বলছিলো।

ইয়া আল্লা। বুড়োকর্তা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ধীরেধীরে ছেলের পাশে বসলেন তিনি। তারপর এক-এক করে ছেলেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। মূর্তিগুলি কত লম্বা ছিলো। কোথায় দাঁড়িয়েছিলো। কেমন করে সামনে এলো। কী কথা ওরা বললো।

হ্যাঁ, সব মিলে যাচ্ছে। হুবহু মিলে যাচ্ছে ওর দেখা স্বপ্নের সঙ্গে। শুধু শিশুর মতো অসহায় দৃষ্টিতে অসুস্থ ছেলেটার দিকে তাকালেন তিনি।

শামসু তখনো কাঁদছে।

গিন্নি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন— কাঁদিস না। কাঁদিস না। কেঁদে কী হবে। আল্লা আল্লা কর্। আল্লাকে ডাক্।

আম্মা। আম্মাগো। বলে কাঁদতে থাকলো শামসু।

গিন্নি তাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। আমাকে ডেকে কী হবে। আল্লাহকে ডাক্।

শামসু এবার শব্দ করে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করলো।

বুড়ো আহমদ আলী শেখ তখনো কপালে হাত রেখে নীরবে বসে। অঘটন যে একটা ঘটবে এ সম্পর্কে তাঁর আর কোনো দ্বিধা নেই। আজ বিশবছর এ পরিবারে কেউ মরেনি।

মৃত্যুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন আহমদ আলী শেখ।

আজ মৃত্যু এসে তাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে।

মনে মনে আজরাইলের কথা ভাবলেন বুড়োকর্তা।

পরলোকের কথা ভাবলেন।

হাশরের ময়দানের কথা ভাবলেন।

বেহেস্ত আর দোজখের কথা ভাবলেন।

তারপর পুত্রকন্যা সবার দিকে তাকালেন তিনি।

তোমরা যাও। ঘরে যাও। আল্লা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। ঘরে গিয়ে আল্লা আল্লা করো।

শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। অনেকদিন হলো তিনি বুড়ো হয়েছেন। কিন্তু বার্ধক্যের অনুষঙ্গগুলো কোনোদিন উপলব্ধি করেননি। আজ মনে পড়েছে। দেহটা ভার-ভার লাগছে। মনে হচ্ছে বুঝি লাঠি ছাড়া তিনি হাঁটতে পারবেন না।

মনসুর আর তার বউ।

দুজন বিছানায় শুয়ে, ঘুম আসছে না। খোলা দু-জোড়া চোখ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

সহসা নীরবতা ভাঙলো বড়বউ। শামসুটা বোধহয় মারা যাবে। ক'মাস ধরেই তো অসুখে ভুগছে। হ্যাঁগো, সেবার যখন স্বপ্ন দেখেছিলো তখন দুজন মারা গিয়েছিলো, তাই না?

হ্যাঁ।

এবারো হয়তো দুজন মারা যাবে। স্বামীর দিকে আড়চোখে একবার তাকালো বড়বউ।

মনসুর কোনো উত্তর দিলো না।

বড়বউ আর একখানা হাত স্বামীর গায়ের ওপরে রাখলো।

কী। ঘুমিয়ে পড়েছো?

না। একটু নড়েচড়ে শুলো মনসুর। তারপর আস্তে করে বললো— আব্বার শরীরটাও তো ক'দিন ধরে খুব ভালো যাচ্ছে না।

বুড়ো মানুষ। শরীরেরই বা কী দোষ! স্বামীর দিকে পাশ ফিরলো বড়বউ। হ্যাঁগো, খোদা না করুক, উনি যদি আজ মারা যান তাহলে তোমাদের বিষয়-সম্পত্তিগুলোর কী হবে?

কী আর হবে। সব ভাইরা সমান ভাগ পাবে।

এটা কিন্তু অন্যায় কথা। বড়বউ উসখুস করলো। তুমি হলে বাড়ির বড়ছেলে। তোমার ভাগে কিছুটা বেশি হওয়া উচিত। এসব নিয়ম-কানুন কারা করেছে গো?

যারা করেছে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো।

মনসুরের কণ্ঠে বিরক্তি।

বড়বউ সঙ্গেসঙ্গে প্রতিবাদ করলো। উঁ। বেশি ছিলো না, ছাই। নিশ্চয়ই তারাও তাদের বাবার মেজো কিংবা সেজো ছেলে ছিলো। তাই ও-রকম নিয়ম-কানুন করেছে। যাই বলো, আগের দিনে নিয়ম-কানুনগুলো কিন্তু খুব ভালো ছিলো।

কী ছিলো? মনসুর স্ত্রীর দিকে তাকালো।

বড় বউ বললো—ওই যে, আগের দিনে শুনেছি রাজা-বাদশারা মারা গেলে তার বড় ছেলে রাজা হতো?

মনসুর আবার চোখজোড়া কড়িকাঠের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

অনেক দুশ্চিন্তার মাঝেও তার ঠোঁটের কোণে সহসা একটা হাসি জেগে উঠলো।

মেজো ছেলের ঘর।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে বিছানায় শুয়ে পাশাপাশি।

কারো চোখে ঘুম নেই।

দুজনেই ঈষৎ উত্তেজিত।

মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে তারা অদূর ভবিষ্যতের নানা সমস্যা নিয়ে কিছুটা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এখনো তার রেশ চলছে।

মেজোবউ বললো— বুঝবে। বুঝবে। আজ বুড়ো মরুক কাল বুঝবে। তুমি তো একেবারে খেয়ালি মানুষ। অত বেখেয়ালি হলে কি চলে? বুড়ো মরে গেলে সব ভাই মিলে তোমাকে ঠকাবে। একটা কানাকড়িও দেবে না তখন বুঝবে।

আহসানের চোখেমুখে বিরক্তি। আহা। এখনো তো আব্বা মরেনি। মরার আগেই আমাকে এত উত্তেজিত করছো কেন।

উত্তেজিত করছি কি আর সাধে। ঘরে ছেলেপেলেগুলো আছে তাদের কথা আমাকে ভাবতে হবে না ? খোদা না করুক, আজ যদি তোমার কিছু একটা হয় তাহলে ওদের নিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায় ?

তুমি একটা ইতর। অস্ত ছোটলোক। মুখ দিয়ে গালাগালিটা এসে গিয়েছিলো। অতিকষ্টে সামলে নিলো আহসান।

আশ্চর্য। আমি মরে গেলে আমার মৃত্যুটা তার কাছে বড় নয়। বড় হলো কেমন করে সে খাবে। পরবে। বাঁচবে।

বাহরে দুনিয়া। বাহ। মনে মনে ভাবলো আহসান। আমি যখন একেবারে ছোট ছিলাম, তখন মা দিনরাত সেবা-শুশ্রূষা করে আমাকে মানুষ করেছে। নিজে না-খেয়ে আমাকে খাইয়েছে। আর আমি যখন আরেকটু বড় হলাম তখন আমার বাবা হাড়ভাঙা খাটুনির রোজগার ব্যয় করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আরও পরে আমি যখন রোজগার করতে শুরু করলাম তখন আমাকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বউ এনেছে।

বউ। পরের মেয়ে।

ধীরেধীরে বাবা-মা'র চেয়ে পরের মেয়েটা আমার আরো আপন হয়ে দাঁড়ালো। তার দুঃখে আমি কাঁদি। তার আনন্দে আমি হাসি। আর সে মেয়েটিই কিনা আজ এত স্বার্থপরের মতো চিন্তা করতে পারলো।

দুত্তুরি ছাই। মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

ঘুমোবার চেষ্টা করলো আহসান। কিন্তু ঘুম এলো না।

একটা সিগারেট শেষ না হতেই আরেকটা সিগারেট ধরালো মকবুল। বাড়ির সেজো ছেলে।

ছোট বউ শুধালো—অত সিগারেট খাচ্ছো কেন ?

মকবুলের চোখজোড়া ঈষৎ লাল। সামনে সরে এসে আস্তে করে বললো— শোনো, যদি কোনো অঘটন ঘটে তাই তোমাকে জানিয়ে রাখছি। তোমার নামে কিছু টাকা আমি আলাদা করে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। কিছু শেয়ারও কেনা আছে। ওই ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্রগুলো রাখা। কাউকে কিছু জানিয়ো না কিন্তু অ্যাঁ।

ছোটবউ ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। জানাবো না। স্বামীর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে বললো—তোমার কি মনে হচ্ছে সত্যিসত্যি কিছু ঘটবে। তার কণ্ঠস্বরে গভীর উৎকণ্ঠা।

সিগারেটের ধোঁয়াটা গিলে নিয়ে মকবুল জবাব দিলো— হায়াত মউত সব আল্লার হাতে। কিছু বলাতো যায় না। শোনো, মধুকে ভালো মাস্টার রেখে বাড়িতে পড়িয়ো। ও একটা ভালো কোচ পেলে ভবিষ্যতে খুব সাইন করবে।

অদূরে শুয়ে-থাকা ছেলের দিকে তাকালো মকবুল। উঠে এসে ওর গায়ে-মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে আদর করলো সে।

মনে হলো যেন নিজেকে অনুভব করলো।

আমার সন্তান।

ওর সারাদেহে আমার রক্ত ছড়িয়ে।

ভাবতে গিয়ে অনেকটা হালকা বোধ করলো মকবুল। ছোটবউ এতক্ষণ নীরবে কী যেন ভাবছিলো। সহসা সে বললো— আমার মনে হয় কী জানো ?

মকবুল চমকে তাকালো স্ত্রীর দিকে। কী ?

মনে হয় শামসুটাই মারা যাবে। বলতে গিয়ে একটা ঢোক গিললো ছোটবউ। আর। আর তোমার আব্বা।

ও। স্ত্রীর দিক থেকে চোখজোড়া নামিয়ে আবার ছেলের দিকে তাকালো মকবুল।

আরেকটা সিগারেট ধরালো।

বুড়োকর্তা আহমদ আলী শেখ বিছানায় শুয়ে।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

আবার স্বপ্ন দেখেছেন।

ঘরের কোণে অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি নীরবে দাঁড়িয়ে।

স্বপ্নের মধ্যেই বুড়োকর্তা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। কে ? কে ওখানে ? ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলো।

কী চাও তুমি ? কেন এসেছো এখানে ? বুড়োকর্তা শুধালেন।

মূর্তি বললো—আপনার দুটি ছেলের জান কবজ করতে এসেছি আমি।

আহমদ আলী শেখ চমকে উঠলেন। ঢোক গিললেন। ধীরে ধীরে শুধালেন— কোন্ দুটি ছেলের ?

কোন্ দুটি ছেলের জান নেবো সেটা আপনাকেই ঠিক করে দিতে হবে। আপনিই বেছে দিন।

অত্যন্ত পরিষ্কার-কণ্ঠে জবাব দিলো ছায়ামূর্তি। বুড়োকর্তা অসহায় শিশুর মতো কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না তাঁর, মনে হলো হাত-পাগুলো সব কাঁপছে।

সহসা পাশে তাকিয়ে দেখলেন, চারছেলে সার বেঁধে আসামির মতো মাথা নিচু করে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়োকর্তা বড়ছেলের দিকে তাকালেন।

বড়ছেলের মুখ শুকিয়ে গেলো। কাঁপা গলায় অস্পষ্ট স্বরে বললো—আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি আব্বা। আমি আপনার বংশের বড় ছেলে। আমি মরে গেলে, আব্বা। আব্বা। আমার অনেকগুলো ছেলেপেলে। আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন আব্বা।

বুড়োকর্তা ধীরেধীরে বড়ছেলের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে এনে মেজোছেলের দিকে তাকালেন। মেজোছেলে ঘামতে শুরু করেছে ততক্ষণে। মুখখানা বিবর্ণ। ফ্যাকাশে।

কাঁদো-কাঁদো গলায় মেজোছেলে বললো—আব্বা। আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি আব্বা। আপনার যখন সেবার অসুখ করেছিলো, আমি সারারাত জেগে আপনার সেবা করেছি। আমি মরে গেলে—আব্বা। আব্বা।

বুড়োকর্তা এবার সেজোছেলের দিকে তাকালেন।

সেজোছেলে ভয়ে কাঁপছে।

মনে হলো এক্ষুনি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যাবে সে। ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কোনোমতে বললো— আব্বা। আমি আপনার সবচেয়ে আদরের ছেলে। মনে নেই আব্বা। সেবার,

আপনার যখন কিছু টাকার দরকার হয়েছিল তখন কেউ দেয়নি। আমি দিয়েছিলাম। আব্বা, আমি মরে গেলে আমার ছোট বাচ্চাটা, আব্বা।

বুড়ো আহমদ আলী শেখ এবার ছোটছেলের দিকে তাকালেন। রোগাক্লিষ্ট ছোট ছেলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেললো। আব্বা, আমি আপনার ছোটছেলে। সবার শেষে দুনিয়াতে এসেছি। আমি এখনো বিয়েশাদিও করিনি আব্বা। এখন আমি মরে গেলে আমার কবরে বাতি দেওয়ারও কেউ থাকবে না আব্বা।

বুড়ো আহমাদ আলী শেখের দু-চোখে পানি ভরে এলো। আবেগে থরথর করে কাঁপছে তার দেহ। চারছেলের দিকে আবার ফিরে তাকালেন তিনি। তারপর সহসা সেই ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে মরিয়া হয়ে বললেন—তুমি। তুমি আমার দুটি ছেলেকে না মেরে তাদের তিন-তিনটে বউ আছে আমার ঘরে। তাদের তিনটে বউকে মেরে ফেলো। বউ মারা গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু ছেলে মারা গেলে ওদের তো আমি আর ফিরে পাবো না।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো আহমদ আলী শেখের ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসলেন কর্তা। চারপাশে চেয়ে দেখলেন। ঘর শূন্য। শুধু এককোণে গিন্নি জোহরা খাতুন জায়নামাজে বসে মোনাজাত করছেন :

ইয়া আল্লাহ। কাউকে যদি মারতে হয় তাহলে সবার আগে আমাকে মারো। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ। আমি বেঁচে থাকতে আমার কোনো ছেলেমেয়ের গায়ে হাত দিয়ো না। আমার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ো না। ইয়া আল্লাহ। আমি যেন তাদের সবার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।

আহমদ আলী শেখ অবাকদৃষ্টি মেলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ ধরে।

সহসা বাড়ির পুরনো চাকর আবদুলের গলা-ফাটানো কান্না আর চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেলেন বুড়োকর্তা।

আম্মাজান। আম্মাজান গো। মইরা গেছে। মইরা গেছে। হন্তদন্ত হয়ে এ ঘরে এসে ঢুকলো আবদুল। ছুটে গিন্নির দিকে এগিয়ে গেলো। মইরা গেছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান।

কী হয়েছে। জায়নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জোহরা খাতুন। আবদুল বললো—বউডা কেমন কেমন করতাছে। হাত-পা খিঁইচা চিল্লাইতাছে। শরীর ঠাণ্ডা অইয়া গেছে আম্মাজান গো। আম্মাজান জলদি কইরা চলেন। আম্মাজান!

কী হয়েছে! কর্তা অবাক হলেন।

বউডা কেমন কেমন করতাছে। শরীর ঠাণ্ডা অইয়া গেছে আম্মাজান গো।

কী হয়েছে। এবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন আহমেদ আলী শেখ।

কী আর হবে। জোহরা খাতুন উত্তর দিলেন। ওর বউয়ের বোধহয় ডেলিভারি পেইন উঠেছে। ক'দিন ধরে বলছি হাসপাতালে দিয়ে আয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। কথাটা সম্পূর্ণ না করেই পাশের ঘরের দিকে ছুটে চলে গেলেন জোহরা খাতুন।

আবদুল তখনো চিৎকার করছে। আম্মাজান গো মইরা যাইবো। মইরা যাইবো আম্মাজান। বউডা আমার মইরা যাইবো।

ওর চিৎকার শুনে বাড়ির সবাই এ ঘরে ছুটে এসেছে ততক্ষণে।

চার ছেলে।

তিন বউ।

একমাত্র মেয়ে আমেনা।

কী হয়েছে ?

আবদুল চিৎকার করছে কেন।

কিরে কী হয়েছে আবদুল।

চিৎকার করবি, না বলবি কী হয়েছে।

কী আর হবে। বুড়োকর্তা আহমদ আলী শেখ আবদুলের হয়ে জবাব দিলেন। ওই উল্লুটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি। বউয়ের বাচ্চা হবে, হাত-পা খিঁচোচ্ছে। তাই দেখে হল্লা শুরু করে দিয়েছে। অপদার্থ কোথাকার।

এমন সময় গিন্নি জোহরা খাতুন আবার এ ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। হায় হায়। মেয়েটা মারা যাবে গো। এই তোরা কেউ এক্ষুনি ছুটে গিয়ে আশেপাশে কোথাও থেকে একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় না। মা তার ছেলেদের সবার মুখের দিকে তাকালেন একবার করে। তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন। জলদি যা।

আবদুল তখনো কাঁদছে। মইরা গেছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান।

চিৎকার করছিস কেন উল্লুক। এখানে চুপচাপ বসে থাক। হঠাৎ রেগে গেলেন বুড়ো কর্তা। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন— ইয়ে হয়েছে। এখন এত রাতে কোথা থেকে ডাক্তার ডাকবে শুনি ?

বড়ছেলে পাশে দাঁড়িয়েছিলো। সে বললো— ডাক্তাররা কি সারারাত জেগে থাকে নাকি ?

মেজো ছেলে বললো— হাজার টাকা দিলেও এখন কোনো ডাক্তার আসবে না।

সবার মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে আবার ফিরে গেলেন গিন্নি জোহরা খাতুন।

আবদুল ততক্ষণে মাটিতে বসে কাঁদছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান। মইরা গেছে।

আহা কাঁদিস না, কাঁদিস না। হায়াত মউত সব আল্লার হাতে, আল্লা আল্লা কর। সরে এসে বিছানার ওপর বসলেন আহমদ আলী শেখ। সহসা তিন বউয়ের দিকে চোখ পড়তে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন— তোমরা সব এখানে হা করে দাঁড়িয়ে কেন। গিয়ে একটু দেখো না মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

শ্বশুরের ধমক খেয়ে তিনবউ তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লো। আমেনা অনুসরণ করলো তাদের।

চারভাই পরস্পরের দিকে একবার করে তাকালো।

বুড়োকর্তা কপালে হাত রেখে বিছানার ওপর চুপচাপ বসে।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না।

সহসা আহমদ আলী শেখ নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন— ইয়া আল্লাহ। ওই দুঃস্বপ্ন কি এমনিতে দেখেছি ? আমি তখন বলিনি তোমাদের ? তোমরা তো বিশ্বাসই করতে চাইলে না। ছেলেদের সবার মুখের ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিলেন বুড়োকর্তা।

আবদুল তখনো কাঁদছে।

বড় ছেলে মনসুর সহানুভূতির স্বরে বললো— কাঁদিস না আবদুল। কেঁদে কী হবে।

সামান্য সান্ত্বনায় আরো ভেঙে পড়লো আবদুল। ভাইসাব গো ভাইসাব। পোলার লাইগা নিজের হাতে ছোট ছোট কাঁথা সিলাই কইরা রাখছিলো গো ভাইসাব।

আবদুল কাঁদছে।

আবার নীরবতা নেমে এলো সারা ঘরে।

চারভাই আবার পরস্পরের দিকে তাকালো।

তাদের চোখেমুখে আগের সেই উৎকণ্ঠা এখন আর নেই। মনে হলো ঘুম পাচ্ছে তাদের।

সহসা মেজোছেলে বললো— মানুষের কার যে কখন মউত এসে যায় কেউ বলতে পারে না।

বড়ছেলে বললো। ওর বউটা স্বভাবে চরিত্রে বেশ ভালোই ছিলো।

সেজোছেলে সমর্থন করে বললো— সারাদিন চুপচাপ কাজকর্ম করতো।

আবার নীরবতা।

বুড়োকর্তা মুখ তুলে আবদুলের দিকে তাকালেন। কাঁদিস না। কাঁদিস কেন। এখন তার কেঁদে কী হবে। তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীর সহানুভূতির ছোঁয়া।

সহসা পাশের ঘর থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দে চমকে উঠলো সবাই।

পরক্ষণে গিন্নি জোহরা খাতুন ছুটে এলেন এ ঘরে। সঙ্গে তিনবউ আর আমেনা।

ওগো শুনছো। যমজ বাচ্চা হয়েছে গো। যমজ বাচ্চা হয়েছে। ওদের সবার চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। আবেগের সঙ্গে বললো।

আবদুল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ওদের দিকে।

অ্যা উল্লুটার কাণ্ড দেখেছো। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন আহমদ আলী শেখ। একসঙ্গে দু-দুটো ছেলের বাপ হয়ে গেছে হারামজাদা। আবার দাঁত বের করে হাসে দ্যাখো না। আবদুলের দিকে তেড়ে এলেন বুড়োকর্তা। যেন হাতের কাছে পেলে এক্ষুনি তাকে দুটো চড় মেরে বসবেন তিনি।

গিন্নি হেসে বললেন। দাঁড়ায়ে রইলে কেন। অজু করে এসো। তাড়াতাড়ি আজান দাও।

বুড়োকর্তা কী বলবেন, কী করবেন ভেবে না-পেয়ে বোকার মতো সবার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন কলতলার দিকে।

বাচ্চাছেলেটা বিছানায় শুয়ে তখনো ঘুমের ঘোরে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। আর বিড়বিড় করে বলছে ঃ আল্লাহতায়ালা বলিলেন— হে ফেরেস্তা-শ্রেষ্ঠ ইবলিশ। আমি তামাম জাহানের শ্রেষ্ঠ জীব ইনসানকে পয়দা করিয়াছি। ইহাকে সেজদা করো। ইবলিশ তবু রাজি হইল না। তবু সেজদা করিল না।

—